বিপদমুক্তির হাতিয়ার

দুআ ইউনুস

মূল
শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀

অনুবাদ
মহিউদ্দিন রূপম

অনুবাদ
মহিউদ্দিন রূপম

সম্পাদনা
মুফতি মাহমুদুল হক

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা
ফজলে মুন

অধ্যায়ের ছবি
মহিউদ্দিন রূপম

বানান
উমেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

'আমার ভাই ইউনুস (ﷺ) তিমির পেটে থাকাবস্থায় যে দুআটি করেছিল:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ "আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।" (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৭)

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যখন এই দুআ পড়ে, আল্লাহ (ﷻ) তাকে নিষ্কৃতি দেন।'

সুনানু আত-তিরমিযী (৩৫০৫), আন-নাসাই (৬০৬)

নীড়পাতা

নবী ইউনুস ১৫
দুআ ইউনুস ৪৭

দুআ ইউনুসের অর্থ ৫১
দুআর অর্থ ৫৩
দুআকারীদের নানান অবস্থা ৫৭
দুআ ইউনুস ৬০
নবী ইউনুসের অবস্থা ৬৭
আল্লাহ কারও প্রতি যুলুম করেন না ৬৮
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'সুবহানাল্লাহ' এর অর্থ ৭০
দুআ ইউনুসে তাহলীল ও তাসবীহ ৭২
দুআ ইউনুসের সারকথা ৭৮

বিপদ দূর করার সেরা মাধ্যম দুআ ইউনুস ৮১
আশা, ভরসা এবং ভয় কেবল আল্লাহর জন্য ৮৩
আল্লাহর কাছেই চাওয়া ৯০
কালেমা পাঠে ইখলাস থাকা চাই ৯৩
তাওহীদের পাশাপাশি ইস্তিগফার করার হিকমত ৯৭
তাওহীদের সঠিক বুঝ ১০১
রাসূল (ﷺ)-কে অনুসরণের গুরুত্ব ১০৫
ঈমানের ব্যাখ্যা ১০৯
ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য ১১১
ইবাদতের সারকথা ১২১
ভুল নিয়ত, ভুল সংকল্প ১২৬
লৌকিকতা এবং আত্মতুষ্টি ১২৮
দাস-রাসূল এবং রাজা-রাসূল ১৩০
আর-রুবূবিয়্যাহ এবং আল-ইলাহিয়্যাহ ১৩৮
নবীগণ মাসুম ১৪৯

তাওবাহ ১৫৪
শেষ ভালো যার, সব ভালো তার ১৬৪
আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন ১৭০
সত্যিকারের তাওবাহ মানুষকে পাল্টে দেয় ১৭৭

নিজের ভুল বুঝতে পারা ১৮৯

গুনাহের খারাপ পরিণতি থেকে বাঁচবেন যেভাবে ১৯৭

প্রথম মূলনীতি ১৯৯
দ্বিতীয় মূলনীতি ২০৩
তৃতীয় মূলনীতি ২০৫

ভরসা শুধু আল্লাহর ওপর ২১৩

মনীষী পরিচিতি ২২১

সম্পাদকের কথা

অনেক সময় মনে প্রশ্ন জাগে, মুমিনরা এত বিপদে পড়ে কেন? অথচ কাফেররা খেয়ে-দেয়ে বেশ ভালোই মেতে আছে! প্রশ্নটা ওমর (রাযি.)-এর মনেও জেগেছিল। তিনি নবীজি (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওই জাতির ভোগ-বিলাস দুনিয়াতেই সব চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১]

মুমিনদের অধিক পরিমাণে পরীক্ষায় নিপতিত হওয়া এজন্যই স্বাভাবিক। সুখ-দুঃখের পালাবদলেই মুমিনের জীবন। যুগে যুগে আসা আল্লাহর পেয়ারা নবীরা এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। নবীজি (ﷺ)-এর ভাষায়:

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأنبياءُ، ثم الأمثلُ فالأمثلُ

অর্থাৎ, সবচেয়ে কঠিনভাবে পরীক্ষিত হন নবীরা, তারপর তাঁদের অনুসারীরা, তারপর তাঁদের ন্যায় যারা আছে, তাঁরা।[২]

অতএব, জীবনের ভয়ংকর কোনো অধ্যায় থাকা মানে আল্লাহ আপনাকে অপছন্দ করেন—বিষয়টি এমন নয়; বরং আল্লাহর সাধারণ রীতি অনুযায়ী প্রিয়ভাজন হওয়ার নিদর্শন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জীবন বিপদশূন্য ছিল না। কঠিন সব পরীক্ষা ও কষ্ট-ক্লেশের মধ্য দিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন তিনি। খলীলুল্লাহ ইবরাহীম, কালীমুল্লাহ মুসা, যবীহুল্লাহ ইসমাঈল (আলাইহিমুস সালাম)-সহ আরও যত নবী ছিলেন, সবাই বিপদসংকুল জীবন অতিবাহিত করেছেন। নবী ইউনুস (আ.)-এর জীবনও এর ব্যতিক্রম ছিল না; তার জীবনে তিন আঁধারে ঘেরা মৎস্য-গ্রাসের বিপদটি আল্লাহর নৈকট্যের নিদর্শন বৈ কিছু নয়। আমরা যেমন বাজার থেকে সামান্য একটি মাটির হাঁড়ি কিনতে গেলে ঠন ঠন করে বাজিয়ে নিই,

---

১. মুসনাদে আহমাদ (৭৯৬৩)

২. তিরমিযী (২৩৯৮); আহমাদ (১৪৯৪); ত্বাবারানী (৬২৯)

তেমনি আল্লাহও তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর পরিশুদ্ধির ব্যাপারে জানা সত্ত্বেও একটু যাচাই করে নেন। তাঁদের ধৈর্য ও তাকওয়ার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ দেখতে পছন্দ করেন। যেহেতু তিনি পক্ষপাতিত্বহীন ইনসাফকারী, তাই তাঁদের উচ্চমর্যাদায় আসীন করার পেছনে দলিল প্রতিষ্ঠিত করে দেন অন্যদের সামনে; যদিও যাকে ইচ্ছে তাকেই তিনি নিজের জন্য নির্বাচন করতে পারেন—এতে কারও কোনো বাধ সাধার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন:

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

'মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাঁদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাঁদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাঁদের পূর্ববর্তীদেরই পরীক্ষা করেছি। কাজেই আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং এটাও অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।' (সূরা আনকাবূত, ২৯: ২-৩)

দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন মনঃকোটরে উঁকি দেয়, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পক্ষ থেকে গুনাহ কীভাবে সংঘটিত হতে পারে? অনেক সাহাবী (রাযি.)-এর জীবনে যিনার মতো সাংঘাতিক গুনাহর বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়! তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়ার পরও কীভাবে এমন হতে পারে? এ প্রশ্নটা অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। আসলে এখানেই তো ফেরেশতা থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। ফেরেশতাদের গুনাহের চাহিদাই নেই আর মানুষ সে চাহিদাকে দমন করে এগিয়ে চলে। কদাচিৎ গুনাহ হয়ে গেলে তাওবার মাধ্যমে আবার আল্লাহর প্রিয়ভাজন হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরামের জীবন পরবর্তীদের জন্য আদর্শ। তাঁরা উত্তম বিষয়ে যেমন আদর্শ, তেমনি গুনাহ হয়ে গেলে তার অনুশোচনা ও তাওবাহ কেমন হওয়া চাই সে বিষয়েও কেয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক উম্মতের জন্য আদর্শ। সাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ ছিলেন না; তবে নবীজির সংশ্রবের বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাই তাঁদের জীবনের কোনো অধ্যায় নিয়ে সমালোচনায় না গিয়ে আদর্শগুলো গ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য। যেমন, নবীজি (ﷺ) মায়েয (রাযি.) সম্পর্কে বলেছিলেন:

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم

অর্থাৎ, 'সে এমন তাওবা করেছে যদি তা মদীনাবাসীর সত্তরজনের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়, যথেষ্ট হয়ে যাবে।'[১]

এরপর নবীদের ব্যাপারগুলো তো আরও স্পর্শকাতর। তাঁদের ব্যাপারে ভুল মতামত মানে ঈমানের ওপর কুঠারাঘাত। তাঁরা আল্লাহর মনোনীত বান্দা। আসমানি ইলম আমাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁদের ওপর আস্থা করেছেন। তাঁদের দৃশ্যত স্খলনগুলো আমাদের ন্যায় প্রবৃত্তিতাড়িত গুনাহ নয়। যেমন, ইউনুস (আ.) স্বজাতির ওপর থেকে আযাব বিদূরিত হওয়ার পর ভাবলেন, তার হুঁশিয়ারি তো মিথ্যা সাব্যস্ত হয়ে গেল! এখন গ্রামে ফিরে গেলে মিথ্যা বলার অপরাধে নির্ঘাত হত্যা করে দেবে তাঁকে। তিনি ভড়কে গেলেন, যেমন মূসা (আ.)-কে বারবার অভয় দিচ্ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ, তবু তিনি সাপ দেখে ভয়-ই পেলেন। আল্লাহ যে বললেন, ভয় পেয়ো না সেদিকে যেন কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। আসলে জীবনের হুমকির মুখে সবাই একটু ভয় পায়; এতে গুনাহর কিছু নেই। তাই তো ইউনুস (আ.) পালিয়েছিলেন, আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। ব্যস, এতটুকুতে প্রিয়নবীর সাথে অভিমান করলেন আল্লাহ। মূলত এতে প্রজ্ঞাময় আল্লাহর বহু প্রজ্ঞা ও রহস্য নিহিত আছে। সে সূত্র ধরে আমরা আমাদের জীবনের বিপদ-আপদে মস্ত বড় এক পাথেয় ও আদর্শ খুঁজে পেয়েছি। আল্লাহ নিজেও বলে দিয়েছেন, কেয়ামত নাগাদ ইউনুসের মতো যে মুমিন আমাকে ডাক দেবে, তাকে আমি উদ্ধার করবো। এ আদর্শের খোরাক এই বইটি থেকে আমরা নিতে পারব বলে আশাবাদী।

আল্লাহর শুকর ও প্রশংসা, শুরুতে ও শেষে। তাঁর অনুগ্রহে বইটির সম্পাদনা শেষ করতে পেরেছি। বইটি অদ্যোপান্ত বেশ কয়েকবার পড়েছি। বইটি মূলত আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) কৃত দুআ ইউনুস-সংবলিত আয়াতের তাফসীর। মূল বইয়ের সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার মাসআলায় সর্বসাধারণের বোধগম্যতার প্রতি লক্ষ রেখে সামান্য কিছু অংশ অনুবাদ থেকে কর্তন করে দিয়েছি। সে স্থানগুলো ... চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ রেখেছি। আল্লাহ তাআলা লেখক, অনুবাদক, পাঠক, প্রকাশক-সহ পুস্তকের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে যেন কবুল করেন। এই দীনি খেদমতের উছিলা করে যেন ক্ষমা করে দেন। আমীন।

মুহাম্মাদ মাহমুদুল হক
২৭ নভেম্বর ২০২১
শিক্ষক, ইফতা বিভাগ, জামিয়াতুস সুন্নাহ
শিবচর, মাদারীপুর

১. মুসলিম (১৪৯৬); তিরমিযী (১৪৫৪)

নবী ইউনুস

আলাইহিস সালামের গল্প

ক্ষণিকের এই জীবনে সুখ দুঃখ পালা বদল করে আসে। কখনো সুখের পাল্লা ভারী হয়, কখনো দুঃখের। জীবন নামক নদীর এই বিরতিহীন স্রোত আমাদের এই শিক্ষাই দেয়, দুনিয়াটা বিশাল হলেও এটা মুমিনের জন্য বড়ই সংকীর্ণ। এখানে পুরস্কার সীমিত পর্যায়ের, তেমনি শাস্তিও। হাদীসের ভাষায়, দুনিয়া মুমিনের জন্য বন্দীশালা আর কাফিরের জান্নাত। কিন্তু সবাই তো রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। তাহলে কেন এই পার্থক্য? পৃথিবী তো একটাই, তবে কেন এই তারতম্য? বিশ্বাস। ঈমানী চেতনা। যেখানে ঈমান আছে, সেখানে ভালো ফলাফল আছে। আর ভালো ফলাফলের জন্য পরীক্ষা অনিবার্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে নবী-রাসূলগণের জীবনকাল নিয়ে ভাবা দরকার। তাহলে বুঝবেন, তাঁদের দুঃখ-কষ্টের বৃত্তান্ত, তাঁদের ধৈর্য সম্পর্কে জানা এবং এগুলো থেকে শিক্ষা নেয়া আমাদের জন্য কতটা জরুরি। নবীরা আমাদের মডেল। তাঁদের জীবনাচার আমাদের জন্য সেরা পাথেয়। তাঁদের গল্প-কাহিনি থেকে আমরা আমাদের আদর্শ খুঁজে পাই। জীবনপথে সফল হতে তাঁরাই আমাদের সেরা পথপ্রদর্শক।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সব নবীর পরীক্ষা নিয়েছেন। হাদীসে এসেছে জগতে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় নবীদের। তাওহীদের মূর্তপ্রতীক ইবরাহীম (আ.)-কে আগুনে ফেলে পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার পরীক্ষা দিতে গিয়ে নিজের স্ত্রী এবং নবজাতক ইসমাঈলকে মক্কার জনমানবহীন স্থানে রেখে আসতে হয়েছিল। পরে ইসমাঈল (আ.) যখন কিশোর বয়সে পা রাখলেন, তখন আবার তাঁকে কুরবানি করার মতো অসম্ভব পরীক্ষা দিতে হয়। ইউসুফ (আ.)-কে ছোটবেলায় বাবা হারাতে হয়েছে, ভাইদের কুচক্রান্তের শিকার হয়ে পরিত্যক্ত অন্ধকার কূপে রাত্রিযাপন করতে হয়েছে। পরবর্তী সময় দাস হিসেবে বাজারে বিক্রি হয়ে গেছেন, যুবক বয়সে ঘরনিদের প্রলোভনের শিকার হয়েছেন, এমনকি দীর্ঘদিন কারাজীবনও ভোগ করতে হয়েছে তাঁর। ইয়াকুব (আ.)-কে সন্তান হারানোর কষ্টে দীর্ঘদিন অন্ধ থাকতে হয়েছে। আইয়ূব (আ.)-কে পরীক্ষা করা হয়েছিল কঠিন রোগবালাই দিয়ে। টানা ১৮ বছর রোগের যন্ত্রণায় ভুগেছেন। একপর্যায় তাঁর শরীরের মাংস খসে পড়তে থাকে। শরীরে পোকা ধরে যায় । রোগশোকের এই দিনগুলোতে এক সহধর্মিণী ছাড়া পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন, এলাকাবাসী কেউ তাঁর পাশে

ছিল না। নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে লোকালয়ের বাইরে গিয়ে তাঁকে থাকতে হয়েছে।[১] মূসা (আ.)-কে ফিরআউনের হাতে প্রাণনাশের ভয় নিয়েই দিনাতিপাত করতে হয়েছে বহু বছর। আবার পরবর্তীকালে যখন ফিরআউনের উৎপীড়ন থেকে রেহাই মিলল, বনী ইসরাইলের কাছেই বারবার কষ্ট পেতে হয়। যাকারিয়া (আ.)-কে তাঁর জাতির লোকেরা করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিল। ঈসা (আ.)-কে হত্যার জন্য রাজদরবারের লোকেরা ঘিরে ফেলেছিল। পরিশেষে মৃত্যু ছাড়াই আল্লাহ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেন। আর আমাদের শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে এত এত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে যে, এখানে নতুন করে বলা বাহুল্য। সীরাতের পাতায় সেই ঘটনাগুলো আজও অমর হয়ে আছে। এভাবে প্রত্যেক নবীই কঠিন সব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছেন।

অন্যান্য নবীদের মতোই নবী ইউনুস (আ.)-কে যে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে, তা বেশ বিস্ময়কর। কুরআনের ভাষায় তাঁকে যুন-নুন বা সহিবুল হূত বলা হয়। এর অর্থ মাছওয়ালা ব্যক্তি। ইউনুস নবীর জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ছিল মাছের পেটে আটকা পড়া। এজন্য তাঁকে যুন-নুন বা সহিবুল হূত বলা হয়। মাছের পেটে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি যেমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, তেমনি মাছের পেট থেকে রেহাই পাবার মধ্য দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল বিপদগ্রস্তের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন।

তিমির পেটে থাকাবস্থায় তাঁর কৃত দুআ আজও স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। সেই দুআর ব্যাখ্যা নিয়েই ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) এই বই লিখেছেন। তবে দুআর ব্যাখ্যা জানার আগে নবী ইউনুসের কাহিনি জানা ফলপ্রসূ হবে। তাহলে পাঠক দুআর অর্থ আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং জীবনের প্রতি পরতে পরতে এর শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

---

১. আইয়ূব আলাইহিস সালাম-এর অসুস্থতা ও বিপদ-আপদ সম্পর্কে যে তাফসীর ওপরে উল্লেখ হলো, তা ইসরাইলী বর্ণনার ভিত্তিতে। তিনি যে আপন সন্তান-সন্ততি, মাল-সম্পদ এবং রোগ-শোক এই তিনটি জিনিস দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন, তা কুরআন-সুন্নাহ থেকে সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত। কিন্তু এসবের তাফসীর পাওয়া যায় ইসরাইলী বর্ণনায়। এসব বর্ণনা থেকে সাব্যস্ত বিষয়াদি সত্য-মিথ্যা উভয়েরই সম্ভবনা রাখে; অর্থাৎ, এগুলো শরীয়তের অকাট্য দলীল নয়—এটাই আমাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের সাথে 'ইসরাইলী বর্ণনা' বলে উদ্ধৃতি করে এসব উল্লেখ করা যায়। পাঠকরাও একই বিশ্বাসের সাথে বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন। তবে আইয়ূব আলাইহিস সালামের শরীরে কীড়া হওয়ার দরুন তাকে ঘৃণাভরে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়—এ জাতীয় বর্ণনাগুলো এড়িয়ে যাওয়াই কাম্য। কারণ, এগুলো নবীর শান ও মর্যাদার খেলাফ—যা অন্যান্য অকাট্য দলীল থেকে সাব্যস্ত। (সম্পাদক)

প্রথমে কুরআনের দিকে তাকানো যাক। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَ اِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

'আর নিশ্চয় ইউনুস ছিল রাসূলদের একজন।'
(সূরা সফফাত, ৩৭: ১৩৯)

ইরাকে একটি অঞ্চল রয়েছে 'মূছেল' নামে। এই মূছেলের একটি জনপদ 'নীনাওয়াহ' বা 'নীনোভা' নামক স্থানেই ইউনুস (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। নীনোভার অধিবাসীদের মাঝে তিনি দাওয়াতি কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাদেরকে বোঝাচ্ছিলেন তাওহীদ কী, পরকাল কী, মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় ইত্যাদি। দ্বীনের বুনিয়াদি বিষয়ের পাশাপাশি প্রচলিত সামাজিক কুপ্রথা, অন্যায়, অনাচারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন তিনি। এভাবে মানুষকে ন্যায়ের পথে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু অতীতের সব সম্প্রদায়ের মতো এই সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলো না। উল্টো তাঁর প্রতি নির্দয়, নির্মম আচরণ করা শুরু করল। তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল দলবেঁধে।

কিন্তু ইউনুস (আ.) হাল ছাড়লেন না। স্বজাতির লোকদের কাছে তিরস্কৃত হলেন, পদে পদে অপমানিত হলেন। একজন মানুষকে যতভাবে কষ্ট দেয়া সম্ভব, কোনো পন্থাই বাদ রাখল না তাঁর জাতির লোকেরা। তিনি যতই ঈমানের দাওয়াহ দিচ্ছেন, ততই আল্লাহর দ্বীনের প্রতি তাদের কুফর ও শত্রুতা প্রকাশ হু হু করে বাড়ছিল। সমাজের অবস্থা এতটাই নাজুক ছিল যে, গোঁয়ার্তুমি ও অবাধ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলল তারা। দ্বীনের প্রতি ঘৃণা যেন সমাজের রন্ধে রন্ধে ঢুকে গেছে। আসলে একটি সমাজ যখন দীর্ঘকাল পাপের সাগরে ভাসতে থাকে, একটা সময় সেই সাগরই তাদের আবাসে পরিণত হয়। তখন কেউ এসে তীরে উঠে আসার আহ্বান জানালে তারা এটাকে পাগলের প্রলাপ বলে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। আমরা দেখতে পাই আল্লাহ তাআলা এই চিরন্তন সংঘাত সম্পর্কে কুরআনেও বলেছেন:

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُوْنَ

'বান্দাদের জন্য আফসোস! তাদের কাছে যখনই কোনো রাসূল এসেছে, তখনই তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে।' (সূরা ইয়াসীন, ৩৬: ৩০)

অতীতের প্রত্যেক জনপদের একটি সামাজিক প্রথা ছিল, আল্লাহর পথের দাঈদের নিয়ে বিদ্রুপ করা; যা আজকের এই সভ্য যুগেও বিদ্যমান। জাহিলি যুগের এই কালচার মানুষ আজও টিকিয়ে রেখেছে। মূলত এই কষ্ট-স্বীকার নবীদের সুন্নাহ, তাঁদের অনুসৃত পথ। তাঁরা আল্লাহর পথে ডাকতে গিয়ে কষ্টের সম্মুখীন হোন, প্রত্যাখ্যাত হোন, হুমকির মুখে পড়েন। কখনো কারাবন্দী, কখনো দেশত্যাগ, কখনো-বা প্রাণনাশের মতো নানা পেরেশানির মধ্য দিয়ে যান। আজও যারা এই পথের পথিক, তাদেরকে একই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কারণ, হক বাতিলের সংঘাত চিরন্তন। সংঘাত না হওয়াই বরং সন্দেহের।

ইউনুস (আ.)-এর জাতির লোকেরা নবীকে সাফ সাফ জানিয়ে দিলো, তারা তাঁকে মানবে না। ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বলল, এত যে ভয় দেখাচ্ছ, পারলে আল্লাহর আযাব নিয়ে আসো। দেখি তোমার রবের শক্তি কতদূর! ইউনুস (আ.) তাদের ঔদ্ধত্য দেখে যারপরনাই অবাক হলেন এবং বিরক্তও হলেন। কোনো জাগতিক ফায়দা ছাড়া দিনরাত যাদের ডেকে চলেছেন, নিঃস্বার্থভাবে যাদের ভালো চাচ্ছেন, তারাই কিনা এত ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে! বিরক্ত হবারই কথা। দীর্ঘকাল দাওয়াতি কাজ করার পর তিনি একপর্যায় ভাবতে বাধ্য হলেন, এই লোকগুলো দাওয়াহর অযোগ্য। এদের সাথে আর নয়। আমি অন্য কোথাও চলে যাব। পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে মানুষদের দাওয়াহ দেবো। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ

'আর (স্মরণ করো) যুন-নুনের কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গেল এবং মনে করল, আমি তাকে পাকড়াও করব না।...' (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৭)

অর্থাৎ ইউনুস (আ.) জাতির লোকদের ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। তাঁর কথায়

তারা যেহেতু কর্ণপাত করছে না, তাই তাদের পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তিনি তাঁর চেষ্টায় সামান্য কসুর করেননি। দাওয়াতে নিজের সর্বোচ্চটা ঢেলে দিয়েছেন জাতির হেদায়াতের জন্য। তা সত্ত্বেও তাদের এই অবহেলা বড়ই হতাশাজনক। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের ছেড়ে চলে যাবেন। দুই চোখ যতদূর যায়। মনে মনে এত দূর ভেবে ফেললেন, সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য মন স্থির করলেন।

নিজের ছামানপত্র গুছিয়ে একটি মালবাহী নৌকায় উঠলেন ইউনুস (আ.) । তিনি সিদ্ধান্তে অনড়, এখানে আর থাকবেন না। আল্লাহর জমিন বিস্তৃত। দাওয়াহর যোগ্য মানুষের অভাব হবে না দুনিয়াতে। তিনি তাদের মাঝে দাওয়াহ দেবেন। যাওয়ার আগে মানুষদের বলে গেলেন, তিন দিন পর আল্লাহর আযাব এসে তোমাদের শেষ করে দেবে।[১] দেখি তোমাদের কত সাহস, কত ক্ষমতা। এই বলে তিনি নৌকায় করে রওনা দিলেন।

নৌকা ভেসে চলছে সাগরের বুক চিরে। কিন্তু সাগরের মাঝপথে আসতেই দেখা দিলো বিপদ। হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠল সাগর। অন্ধকার ছেয়ে গেল চারিদিকে। যেন আকাশ থেকে কেউ কালো রং ছুড়ে দিয়েছে মাঝসমুদ্রে! বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে শুরু করল। ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মালবাহী নৌকাও দুলছে সমান তালে। ক্ষণিক বাদেই শুরু হয়ে গেল প্রবল ঝড়। যাত্রীদের মাথায় যেন বাজ পড়ল এবার। একে তো নৌকা মালভর্তি, অন্যদিকে প্রচণ্ড তুফান! গন্তব্য এখনো বহু দূর। ফিরে যাবারও সুযোগও নেই। কী উপায়? প্রাণ নিয়ে কি ফেরা সম্ভব হবে? আতঙ্কে সবার বিহ্বল অবস্থা। সিদ্ধান্ত হলো, বেঁচে থাকতে হলে আমাদেরকে নৌকার বোঝা কমাতে হবে। মালপত্র ফেলে দেয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। তারা নৌকার ভার কমানোর জন্য নিজেদের মালপত্র সমুদ্রে ফেলতে আরম্ভ করল। একে একে সবাই তাদের ভারী মাল ফেলে দিলো। কিন্তু তাতেও বিপদ কাটার জো নেই।

তুফান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বড় বড় ঢেউয়ের কারণে নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম। লোড আরও কমাতে হবে, নইলে সবাইকে ডুবে মরতে হবে নিশ্চিত। এবার যাত্রীরা সিদ্ধান্ত নিল, যাত্রীদেরকেই ফেলে দিয়ে নৌকার বোঝা কমাবে। সবাই না বাঁচুক, অর্ধেক মানুষ তো বাঁচবে! ইতিহাসবিদদের অনেকে এ মতও ব্যক্ত করেছেন, সে সময় যাত্রীরা তাদের ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী বলাবলি করল, নিশ্চয়ই এই নৌকায় এমন কেউ আছে, যে তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। এজন্য আমরা এই ঝড়ের

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১ম খণ্ড)

কবলে পড়েছি। কাজেই সেই লোককে নৌকা থেকে ফেলে দিতে হবে।

এই বক্তব্যকে যদি আমরা সত্য ধরে নিই, তাহলে এখানে একটি শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তা হলো, বান্দা যতই আল্লাহর থেকে পালিয়ে বেড়াক, আল্লাহর নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলুক, আল্লাহ ছাড়া তার গতি নেই। আল্লাহর ছাড়া সে এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারবে না। আল্লাহকে ছেড়ে যত প্লান প্রোগ্রাম করুন, দিন শেষে আপনার প্লান থুবড়ে পড়বে। আর যদি কিছু পানও, দেখবেন সেটা ছিল ক্ষণিকের সাফল্য। যা বাস্তবিক অর্থে মরীচিকা বৈ কিছু নয়। মূলত দুটো কর্মফল আসতে কখনো কালবিলম্ব হয় না: (১) পাপের দরুন সুখী-জীবনের সংকীর্ণতা, (২) তাওবার দরুন সুখী-জীবনের প্রশস্ততা। আর এই দুটো জিনিস আমাদেরকে বারবার এটাই শেখায়, আল্লাহ ছাড়া এই জগৎ কিছুই না। তিনি বিনা আমরা এক মুহূর্তও জীবিত না।

ইউনুস (আ.)-এর নৌকায় যাত্রীদের মাঝে প্রচণ্ড বাগ্‌বিতণ্ডা চলছে। প্রথম ব্যক্তি কে হবে, কাকে সবার আগে সমুদ্রে ফেলা হবে—কেউ সমাধানে আসতে পারছে না। বিভেদ এড়ানোর জন্য তারা স্থির করল নিজেদের মধ্যে লটারি করবে। এই উত্তাল সমুদ্রে বেঁচে থাকার এটাই একমাত্র পথ। শুরু হলো লটারি। কিন্তু সবাইকে তাক লাগিয়ে প্রথমেই এল ইউনুস (আ.)-এর নাম। যাত্রীরা বলল, এটা অসম্ভব! আমরা কিছুতেই ইউনুসকে ফেলে দিতে পারি না। এই নৌকার সবচেয়ে ভালো মানুষ তো সে। তাঁকে কীভাবে সমুদ্র ফেলে আমরা নিরাপদে তীরে ফিরব! এটা মোটেও বিবেক সায় দেয় না। চলো আমরা আবার লটারি করি।

তারা আবার লটারি করল। এবারও ইউনুসের নাম। তৃতীয়বারের মতো লটারি হলো। আবারও ইউনুস (আ.)-এর নাম! কিন্তু নৌকার লোকেরা তাঁকে সমুদ্রে ফেলতে নারাজ। কারণ, নৌকায় থাকাবস্থায় তারা দেখেছে, তিনি একজন ভালো মানুষ। আসলে লোকেরা বুঝতে পেরেছিল, তারা যদি ইউনুস (আ.)-এর সাথে থাকে, তাহলেই তারা বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। কারণ, তিনি হচ্ছেন সব থেকে উত্তম ব্যক্তি। এ রকম কাউকে সাগরে নিক্ষেপ করে কিছুতেই উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়।

একই নজির আজকের যুগেও দেখবেন। সমাজের যে মানুষগুলো বুদ্ধিজীবীদের স্থান দখল করে আছে, বিপদে পড়লে কিংবা অন্তিম মুহূর্তে তারা নেককার মানুষদের

দ্বারস্থ হয়। আজীবন যাদেরকে সেকেলে, অসামাজিক বলে তুচ্ছজ্ঞান করে, সমাজের সবচেয়ে নীচু শ্রেণি গণ্য করে, তাদেরই ইমামতি ছাড়া কবরে নামতে পারে না। আসলে মানুষ যতই অপরাধ করুক, ওপর দিয়ে যতই বিরুদ্ধাচরণ করুক, আপনি যখন দ্বীনের পথে অবিচল থাকবেন, মানুষ ঠিকই উপলব্ধি করতে পারবে আপনি ন্যায়ের পথেই আছেন। স্রোতের বিপরীতে আপনি একা হলেও মানুষ আপনার শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত অনুধাবন করতে পারবে। হোক সেটা বিপদে পড়ে কিংবা সুসময়ে। এজন্য আয়েশা (রাদ্বি.) বলেছেন:

من أَرْضى اللهَ بِسَخَطِ الناسِ، رَضِيَ اللهُ عنه وأَرْضى عنه الناسَ، ومن أَرْضى الناسَ بسَخَطِ اللهِ، عادَ حامِدُهُ مِنَ الناسِ (لَهُ) ذامًّا

'যে ব্যক্তি মানুষদের নারাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, তার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন এবং মানুষদেরকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। পক্ষান্তরে যে আল্লাহকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, মানুষের মধ্য হতে তার প্রশংসাকারীরা তার নিন্দুকে পরিণত হয়।'[১]

লটারিতে পরপর তিনবার একই ব্যক্তির নাম ওঠা—বিষয়টি নেহায়েত কাকতালীয় না। ইউনুস (আ.) বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তিনি আল্লাহর নবী হওয়ায় বুঝতে কষ্ট হলো না, লটারিতে পরপর তিনবার তার নাম উঠার বিষয়টি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই ঘটছে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে একটি বার্তা দিতে চাচ্ছেন। ইউনুস (আ.) এটা বোঝামাত্র এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। সবার চোখ এড়িয়ে সোজা ঝাঁপ দিলেন সমুদ্রে। তখন বিশালাকৃতির একটি সামুদ্রিক মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেলল এবং সমুদ্রের অন্ধকার তলদেশে হারিয়ে গেল।

তাফসীর বিশারদগণের মতে সায়্যিদুনা ইউনুস (আ.) যখন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, তখন তিনি অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যখন চৈতন্য ফিরে এল, একটি গাঢ় অন্ধকার স্থানে নিজেকে আবিষ্কার করলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, এটা কোথায়। স্থানটা এতই অন্ধকার ছিল যে, দেখা যাচ্ছিল না কিছুই। শুধু যে বিষয়টি স্মরণ

১. শারহুল ত্বহাবী, আলবানী: সহীহ, তিরমিযী (২৪১৪); ইবনু হিব্বান (২৭৭)

করতে পারছেন তা হলো, তিনি উত্তাল সমুদ্রে নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এরপর কী ঘটেছে মনে নেই। ইউনুস (আ.) স্থির বসে না থেকে চারিদিকে হাতিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন এটা কোথায়। এক সময় মনে হলো, এটাই কি কবর? বারযাখের জীবন? এভাবে কিছু সময়ের জন্য ইউনুস (আ.) ভাবলেন তিনি বুঝি মারা গেছেন।[১] কিন্তু এই ধারণাও বেশিক্ষণ টিকলো না। চারিদিকে হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন এবং এরপর সংবিৎ ফিরে পাওয়া মাত্র বুঝলেন, এটা কবর নয়, তিনি মারাও যাননি; বরং মাছের পাকস্থলীতে অবস্থান করছেন। এভাবে মাছের পেটে বন্দী হলেন ইউনুস আলাইহিস সালাম।

নীনোভায় এই দিকে বিপ্লব ঘটে গেল। ইউনুস (আ.) যখন তাঁর জাতিকে ছেড়ে চলে যান, আল্লাহর আযাব তখন আসি আসি অবস্থা। আকাশ কালো হতে শুরু করেছে। পুরো পরিবেশ ঝিম মেরে আছে। বিপদের ঘনঘটা দেখে নীনোভার লোকেরা বুঝতে পারল, এবার আযাব এসে পড়বে সত্যি সত্যিই। তাঁরা ভয়ে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ছুটতে শুরু করল। কিন্তু পালাবে কোথায়? কে তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে? কেউই নেই। আল্লাহর আযাব যখন আসে, কোনো পরাশক্তি মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। জাগতিক ক্ষমতা, শক্তিমত্তা, প্রযুক্তি সব থুবড়ে পড়ে তখন।

নীনোভার লোকদের অন্তরে তাওবার অনুভূতি জেগে উঠল। লজ্জিত হলো এ ভেবে, তারা ইউনুসের সাথে কী কী করেছে, কতভাবে অন্যায় করেছে। বুঝতে পারল, তিনি সত্য নবী। সে যুগে দৈন্যের প্রতীক ছিল মোটা কাপড়। তারা সবাই মোটা কাপড় পরে নিল এবং সব পশুশাবককে তাদের মায়েদের থেকে আলাদা করে দিলো। এরপর আল্লাহর দরবারে কাতর হৃদয় নিয়ে প্রার্থনা শুরু করল। করুণ স্বরে ফরিয়াদ করল। আল্লাহকে ডাকতে থাকল অনুনয়-বিনয় করে। স্বীকার করে নিল নিজেদের অপরাধ। কারণ, এই বিপদ থেকে একমাত্র তিনিই উদ্ধার করতে পারেন। নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, তরুণ-বৃদ্ধ, সবাই মিলে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতে লাগল। এলাকার প্রতিটি জীব-জন্তু কাতরাতে লাগল। প্রচণ্ড ভীতিকর একটি পরিস্থিতি তৈরি হলো নীনোভায়। আল্লাহর নবীর সাথে যে আচরণ তারা করেছে, এর ফলাফল এখন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। আল্লাহর আযাব তাদের মাথার ওপর এসে গেছে, রাতের তিমির রাশির ন্যায় ঘুরছে মাথার ওপর। লোকেরা বুঝতে পারল, ইউনুস (আ.) আল্লাহর সত্য নবী এবং দ্রুত তাওবাহ করে নিল। ফলে আল্লাহ

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৬)

তাদের তাওবাহ কবুল করে নিলেন এবং আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিলেন।

ইউনুস (আ.) তখনো মাছের পাকস্থলীতে বন্দী। এখানে একটি বিষয় বোঝার আছে, মাছের পাকস্থলী কিন্তু কোনো পাঁচ তারা রেস্তোরাঁ না, কোনো আরামদায়ক স্থানও নয়। আমরা জানি পাকস্থলীর কাজ খাদ্য হজম করা। হাড়, মাংস সবকিছুকে গলিয়ে হজম করার জন্য যেসমস্ত উপাদান দরকার, সেগুলোই থাকে এই পাকস্থলীতে। খাদ্য হজমকারী তরল পদার্থ সহ নানান উপাদানে ভরপুর। আরেকটি বিষয় লক্ষ করলে দেখতে পাব, মাছ কিন্তু খুব কমই খাদ্য চিবিয়ে খায়। সম্পূর্ণ খাবার আস্ত গিলে ফেলা তাদের খাদ্যাভ্যাস। কখনো যদি একটি মাছকে আড়াআড়ি চিড়ে ফেলেন, দেখবেন সেখানে কিছু খাবার রয়ে গেছে। বড় বড় মাছের পেটে অনেক সময় ছোট ছোট আস্ত মাছও পাওয়া যায়। তো সেই হজমকারী উপাদানের মাধ্যমে মাছের পেটে থাকা সবগুলো খাবার টুকরো টুকরো হয়ে গলতে থাকে। প্রত্যেকটা মাংসকণাকে হাড় থেকে আলাদা করে ফেলে। এভাবে মাছেদের খাবার হজম হয়। কাজেই চিন্তা করুন, এ রকম এক স্থানে ইউনুস (আ.)-এর অবস্থা কতটা নাজুক ছিল, কতটা অসহায় ছিলেন তিনি! এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন ইউনুস আলাইহিস সালাম। আল্লাহর পরীক্ষা কখন আসবে, কীভাবে আসবে, পরীক্ষা আসার এক মুহূর্ত আগেও আঁচ করা যায় না।

ইউনুস (আ.) ভেবেছিলেন তিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অন্য জনপদে চলে যেতে পারবেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিক্রমায় বন্দী হলেন মাছের পেটে। এ থেকে বোঝা যায়, মানুষ যা চায়, সব সময় তা পায় না। পৃথিবীর সেরা মানুষগুলোর সাথেও একই ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি সব সময় আপনার অনুকূলে থাকবে না—এটাই স্বাভাবিক। এই জীবনে সুখ-দুঃখ পালা বদল করে আসে। এটাই দুনিয়ার জীবনের সংজ্ঞা। কোনো কিছুই এখানে চিরস্থায়ী নয়। জীবনের কোনো সুখই আমৃত্যু তৃপ্ত রাখতে পারে না, আবার কোনো দুঃখই আজীবন থেকে যায় না। জীবন বড়ই সঙ্গিন, এর চেয়েও বড় সঙ্গিন এখানকার সুখ-দুঃখগুলো। এর শুরুটা স্বপ্নের মতো আর শেষটা স্বপ্ন ভাঙার মতো। কাজেই এই জীবনকে চূড়ান্ত ভেবে ধোঁকা খেলে বিপত্তি। আয়েশা (রাদ্বি.) এজন্যই বলতেন:

الدُّنيا دارُ من لا دارَ له ، ومالُ من لا مالَ له ، ولها يجمَعُ

من لا عقلَ له

'এই দুনিয়া তারই ঘর, যার কোনো ঘর নেই; তারই সম্পদ, যার কোনো সম্পদ নেই; আর এই দুনিয়ার জন্য সে-ই জমায়, যার কোনো বুদ্ধি নেই।'[১]

বিপদের সময় কেউ আমাদের ধৈর্যের কথা বললে তাকে হয়তো শুনিয়ে দিই, 'তুমি আমার অবস্থানে নেই। তুমি বুঝবে না আমি কিসের মধ্যে আছি।' কথা ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের অবস্থা কি ইউনুস (আ.)-এর চাইতেও খারাপ? যদি প্রতিকূল পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে কেউ পার পেতে পারত, তাহলে ইউনুস (আ.)-ই সবথেকে বেশি যোগ্য ছিলেন। কারণ, তিনি যে বিপদের মধ্য দিয়ে গেছেন, এ রকম বিপদের সম্মুখীন আমরা কেউই হইনি। এজন্য বিপদের শুরুতে সবর প্রয়োজন। হতাশা কখনোই সমাধান নয়। তাকদীর নিয়ে অভিযোগ করলে তাকদীর পাল্টে যায় না। বরং বিপদকালে তাকদীর নিয়ে হতাশায় ভোগা আগুনে কয়লা ছোড়ার মতো। আগুন তো নিভবেই না, উল্টো বাড়িয়ে দেবে।

আমাদের নবীজি মুহাম্মাদ (ﷺ) একবার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, একটি কবরের পাশে বসে একজন মহিলা কাঁদছে। দূর থেকে দেখে বুঝতে কষ্ট হলো না, কবরটা কোনো বাচ্চার। আর মহিলাটি সম্ভবত তার মা। অল্প বয়সে বুকের ধনকে হারিয়ে সে ব্যথিত। তাই কবরের পাশে বসে কাঁদছে। সন্তানহারা মায়ের এই দৃশ্য দেখে নবীজির মনে দয়া হলো। কাছে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহর প্রতি তাকওয়া রাখো। ধৈর্য ধরো।' কিন্তু কেন যেন মহিলার সদুপদেশ পছন্দ হলো না। চ্যাঁচিয়ে উঠল, 'এখান থেকে যান। আমি যে বিপদে আছি, আপনি তাতে পড়েননি।' আসলে সে নবীজিকে চিনতে পারেনি। তাই চরম শোকে অসংগত কথা বলে ফেলেছে। নবীজি কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন সেখান থেকে। ক্ষণিকবাদেই পথচারিরা সেই মহিলাকে বকা দিয়ে বলল, আরে তুমি কাকে কী বললে?! উনি তো আল্লাহর রাসূল। 'আল্লাহর রাসূল!' এই কথা শুনতেই মহিলার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সে তড়িঘড়ি করে ছুটে গেল নবীজির দুয়ারে। গিয়ে দেখল, সেখানে দারোয়ান নেই। কার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইবেন! এই দিকে তার মন ছটফট করছে, আল্লাহর নবীর শানে এ রকম বেয়াদবি করা মোটেও সমীচীন হয়নি। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে তার। তাই সরাসরি ঢুকে পড়ল কারও অপেক্ষায় না থেকে। এরপর নবীজিকে করজোরে সে

১. মুসনাদে আহমাদ (২৪৪৬৪); আয-যুহুদ, ইবনু আবিদ দুনইয়া (২৪০)

বলল, 'আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।' নবীজি (ﷺ) বিষয়টি আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন অবশ্য। তাই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কষ্টের শুরুতে সবর করাটাই সত্যিকারের সবর।'[১]

মাছের পেটে এমন কঠিন বিপদের মুহূর্তে সায়্যিদুনা ইউনুস (আ.) চেতনা ফিরে পাওয়ার পর সর্বপ্রথম কোন কাজটি করেছিলেন জানেন? মুফাসসিরগণের উদ্ধৃতিতে এসেছে, চেতনা ফিরে পেয়ে সর্বপ্রথম তিনি আল্লাহর সিজদায় লুটে পড়েন। সিজদায় মাথা ঠেকিয়ে বলেন, 'ইয়া আল্লাহ, আমি এমন এক স্থানে থেকে আপনাকে সিজদা করছি, যেখানে এর আগে আপনার কোনো বান্দা আপনাকে সিজদা করেনি।' এরপর তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত দুআটি করলেন, যেটা পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ أَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

'...তারপর সে অনেক অন্ধকার থেকে আহ্বান করল, "আপনি ছাড়া কোনো (সত্য) উপাস্য নেই; আপনি পবিত্র, মহান। অবশ্যই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের একজন হয়ে গেছি।"' (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৭)

ইউনুস (আ.) বলছেন, ইয়া আল্লাহ, আপনি পবিত্র, আপনি মহান! আর অবশ্যই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের কাতারে চলে গেছি। আমাদের এই বইটি এই দুআরই ব্যাখ্যা। কী আছে এই দুআয়, কেন প্রত্যেক বিপদগ্রস্তের জন্য এটি সেরা পাথেয়— ইনশাআল্লাহ সামনে আমরা জানবো।

ইতোমধ্যে আমরা পড়েছি, ইউনুস (আ.) যখন তাঁর কওমকে ছেড়ে চলে যান, তখন সেই কওমের জন্য আল্লাহ তাআলার আযাব অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তাদের ওপর আল্লাহর গযব আশু অবস্থা। এই দিকে ইউনুস (আ.) ছিলেন আল্লাহর রাসূল এবং সেই জাতির ওপর একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আমরা জানি কিয়ামতের দিন প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। হাদীসে এসেছে:

---

১. সহীহ বুখারী (১২৫২, ১২৮৩, ১৩০২, ৭১৫৪); মুসলিম (৯২৬); তিরমিযী (৯৮৮)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাদ্বি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'জেনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির ওপর দায়িত্বশীল, সে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোনো ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখো, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[১]

ইউনুস (আ.) তাঁর জাতির লোকদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। তিনি জানতেন আযাব আসছে। তাঁর দায়িত্ব তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। সবার মাঝে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু লোকেরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই তিনি আর অপেক্ষা না করে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই চলে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার হুকুম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না। মূলত এই কারণে আমরা দেখতে পাই, তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

১. সহীহ বুখারী (৬৬৫৩); মুসলিম (১৮২৯); আবু দাউদ (২৯২৮)